بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৬ অক্টোবর, ২০২৩ মোতাবেক ০৬ ইখা, ১৪০২ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত খুতবায় আসমা'র মৃত্যুদণ্ডের ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম, আর আমি বলেছিলাম যে, একই ধরনের আরো একটি ঘটনা রয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনাও কেবল একটি মনগড়া গল্প বলে মনে হয়। এই দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো আবু আফাক ইহুদীর হত্যা সংক্রান্ত। এখানে লেখা আছে যে, সীরাত গ্রন্থসমূহে আরেকটি কাল্পনিক ঘটনা আবু আফাক ইহুদীকে হত্যার বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। কথিত আছে যে, একদিন রসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদের বলেন, কে আমার পক্ষ হয়ে এই কুচক্রী অর্থাৎ আবু আফাককে সামলাবে? অর্থাৎ কে তার ভবলীলা সাঙ্গ করতে পারবে বা তাকে হত্যা করতে পারবে? এই ব্যক্তি অর্থাৎ আবু আফাক অনেক বেশি বয়োবৃদ্ধ মানুষ ছিল। বলা হয় যে, তার বয়স ১২০ বছর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই ব্যক্তি মানুষকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত আর নিজ কবিতায় মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অশালীন কথা বলতো ও অবমাননাকর আচরণ প্রদর্শন করত। মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশে হযরত সালেম বিন উমায়ের ওঠেন, তিনি তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা খোদা তা'লার ভয়ে অনেক কাঁদতেন। তিনি বদরের যুদ্ধেও অংশ নিয়েছিলেন। তিনি নিবেদন করেন, আমি মানত করছি যে, হয় আমি আবু আফাককে হত্যা করব অথবা এই চেষ্টায় নিজ প্রাণ বিসর্জন দেবো। এরপর হযরত সালেম বিন উমায়ের সুযোগের সন্ধানে থাকেন। একরাতে প্রচণ্ড গরম ছিল আর আবু আফাক নিজের ঘরের বাইরে আঙ্গিনায় ঘুমিয়ে ছিল। হযরত সালেম একথা জানতে পেরে তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হন। সেখানে পৌঁছে হযরত সালেম নিজ তরবারি আবু আফাকের কলিজার ওপর রেখে পুরো জোরে চাপ দেন। এমনকি সেই তরবারি তার পেট চিরে বিছানায় গেঁথে যায়। একইসাথে খোদার শত্রু আবু আফাক এক প্রচণ্ড চিৎকার দেয়। হযরত সালেম তাকে সেই অবস্থায় রেখেই সেখান থেকে চলে আসেন। আবু আফাকের চিৎকার শুনে তাৎক্ষণিকভাবে মানুষ দৌড়ে আসে। আর তার কতিপয় সঙ্গী তখনই তাকে উঠিয়ে ঘরের ভেতরে নিয়ে যায়। কিন্তু খোদার এই শত্রু উক্ত আঘাত কাটিয়ে উঠতে পারে নি আর মারা যায়। এই ঘটনাটি একটি সীরাত গ্রন্থে এভাবেই লেখা হয়েছে। এই ঘটনাটিও কোনো নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয় নি। সিহাহ্ সিত্তাহ্তেও এটির উল্লেখ নেই। যদিও কতিপয় সীরাত গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, যেমন– সীরাত হালাবিয়া, শারাহ যুরকানী, তাবাকাতুল কুবরা ইবনে সা'দ, সীরাতুন নবভীয়া ইবনে হিশাম, আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, কিতাবুল মাগাযী আল-ওয়াকদী এবং সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ ইত্যাদিতে। কিন্তু অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ নেই। উদাহরণস্বরূপ আল-কামেল ফিত্-তারীখ, তারীখে তাবারী, তারীখ ইবনে খলদূন ইত্যাদি। কিন্তু ইতিহাসের অন্য কতিপয় গ্রন্থে উক্ত ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে।

এই ঘটনা সম্পর্কেও, আসমার ঘটনার ন্যায় বলা হয়ে থাকে যে, সে মহানবী (সা.)-এর শত্রুতা ও বিরোধিতায় মানুষকে উত্তেজিত করত। বদরের যুদ্ধের পর সে হিংসা ও বিদ্বেষে

আরও সীমাতিক্রম করে আর প্রকাশ্য বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আবু আফাকের তথাকথিত হত্যা-সংক্রান্ত রেওয়ায়েতের আভ্যন্তরীণ বৈপরীত্যও এই ঘটনাকে সন্দেহপূর্ণ করে তোলে। যেমন, প্রথমত হত্যাকারীর বিষয়ে মতভিন্নতা। ইবনে সা'দ ও ওয়াকদীর মতে আবু আফাকের হত্যাকারী ছিলেন সালেম বিন উমায়ের। অথচ অন্য কতিপয় রেওয়ায়েতে সালেম বিন উমরের উল্লেখ রয়েছে, আবার ইবনে উকবার মতে সালেম বিন আব্দুল্লাহ্ বিন সাবেত আনসারী তাকে হত্যা করেন। দ্বিতীয়ত হত্যার কারণ সম্পর্কেও মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে হিশাম এবং ওয়াকদীর মতে সালেম স্বয়ং উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করেন, অথচ কতিপয় রেওয়ায়েত অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়েছে; ইবনে হিশামে এমনটিই লেখা আছে। তৃতীয় বিষয়টি হলো ধর্মীয় মতবিরোধ সংক্রান্ত। ইবনে সা'দের মতে আবু আফাক ইহুদী ছিল, অথচ ওয়াকদীর মতে সে ইহুদী ছিল না। এছাড়া হত্যার যুগ সম্পর্কেও মতবিরোধ রয়েছে। ওয়াকদী ও ইবনে সা'দের মতে এই ঘটনাটি আসমা বিনতে মারওয়ানের হত্যার পরের ঘটনা। অথচ ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশাম প্রমুখের মতে এই ঘটনাটি আসমার হত্যার পূর্বের ঘটনা। এসব স্পষ্ট মতভিন্নতা থেকেও একথা স্পষ্ট যে, এটি কেবল বানোয়াট ও মিথ্যা গল্প, এর কোনো বাস্তবতা নেই। তর্কের খাতিরে যদি আবু আফাকের নিহত হওয়ার কথা মেনেও নেয়া হয় তাহলেও তার অন্যান্য অপরাধ– দেশের প্রধানকে হত্যার জন্য প্ররোচিত করা, ব্যঙ্গাত্মক কবিতা পাঠ করে যুদ্ধের জন্য উস্কানি দেয়া, সর্বসাধারণের শান্তি বিঘ্নিত করা আর যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিত করাই মৃত্যুদণ্ডের জন্য যথেষ্ট। আজও এগুলোর জন্য বা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রমাণিত হলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। কেবল গালমন্দ করা এই হত্যার কারণ হতে পারে না। অনুরূপভাবে আসমার ঘটনার ন্যায় এখানেও আবু আফাকের হত্যার পর ইহুদীদের কোনো প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন প্রমাণিত হয় না। ইহুদীদের তার হত্যার কারণে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত ছিল, কিন্তু কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়ার কথা প্রমাণ হয় না। সুতরাং তাদের নিশ্চুপ থাকা উক্ত ঘটনার বানোয়াট হওয়ার ক্ষেত্রে অকাট্য দলিল। একথা স্মরণ রাখার যোগ্য যে, বলা হয়ে থাকে, এসব ঘটনা বদরের পূর্বে বা বদরের অব্যবহিত পর ঘটেছে। সব ঐতিহাসিকের ঐকমত্য রয়েছে যে, মুসলমান ও ইহুদীদের প্রথম লড়াই হলো বনু কায়নুকার যুদ্ধ। যদি বদরের পূর্বেও কোনো ঘটনা ঘটতো তাহলে এর নীচে অবশ্যই উল্লেখ করতো যে, এভাবে ঘটনা ঘটেছে। আর ইহুদীরা আবু আফাক ও আসমার হত্যার ঘটনার ভিত্তিতে বৈধভাবে মুসলমানদের ওপর এই আপত্তি করতে পারতো যে, মুসলমানরা কার্যত প্রথমে তাদের উত্যক্ত করেছে। কিন্তু কোথাও এই উল্লেখ পাওয়া যায় না যে, মদীনার ইহুদীরা এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে কখনো এমন কোনো প্রশ্ন তুলেছে। হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আসমা ও আবু আফাকের হত্যার মনগড়া ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে যা বর্ণনা করেছেন তা এরূপ: ওয়াকদী এবং অন্য কতিপয় ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধের পরের এমন দুটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছে যেগুলোর হাদীসগ্রন্থ ও ইতিহাসের সঠিক রেওয়ায়েতসমূহে কোনো উল্লেখ নেই। দেরায়েতের দিক থেকেও যদি লক্ষ্য করা হয় তাহলে সেগুলো সঠিক প্রমাণিত হয় না। কিন্তু যেহেতু এগুলোর মাধ্যমে আপাত দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে একটি আপত্তির সুযোগ সৃষ্টি হয় তাই কতিপয় খ্রিষ্টান ঐতিহাসিক অভ্যাসবশত একান্ত অসহনীয় রূপে এগুলোর উল্লেখ করেছে। এসব মনগড়া ঘটনা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মদীনায় আসমা নামের এক নারী বাস করতো; [আসমার উল্লেখ এখানে পুনরায় আসছে;] সে ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়াবহ শত্রু ছিল। মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে অনেক বিষোদগার করতো এবং নিজের

উস্কানিমূলক কবিতার মাধ্যমে মানুষকে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক ক্ষেপাতো এবং তাঁকে হত্যা করতে উস্কানি দিতো। অবশেষে এক অন্ধ সাহাবী উমায়ের বিন আদী উত্তেজিত হয়ে রাতের বেলা তার ঘরে গিয়ে সে ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় তাকে হত্যা করেন। যখন মহানবী (সা.) এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারেন তখন তিনি সেই সাহাবীকে ভর্ৎসনা করেন নি, বরং বলা হয়ে থাকে যে, এক প্রকার তার কাজের প্রশংসা করেন। [কাজের প্রশংসা করেছেন বলতে এটি বুঝায় না যে, বাস্তবেই তা করেছেন; কেননা এই ঘটনা যে অলীক তা আমি সাব্যস্ত করে এসেছি।]

দ্বিতীয় যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো, আবু আফাক নামের এক বৃদ্ধ ইহুদী মদীনায় বাস করতো। সে-ও মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক কবিতা শুনাতো এবং কাফেরদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও তাঁকে হত্যা করতে উত্তেজিত করতো। বলা হয় যে, অবশেষে তাকেও একদিন সালেম বিন উমায়ের নামের একজন সাহাবী রাগন্বিত হয়ে রাতের বেলা তার বাড়ির আঙ্গিনায় হত্যা করেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন,

ওয়াকদী এবং ইবনে হিশাম উস্কানিমূলক কিছু পঙক্তিও সংকলন করেছেন যা আসমা এবং আবু আফাক মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে শোনাতো। এই দুটি ঘটনাকে স্যার উইলিয়াম মুইর প্রমুখ ব্যক্তি অত্যন্ত অরুচিকরভাবে উল্লেখ করে নিজেদের পুস্তকের সৌন্দর্য বর্ধন করেছে। এই প্রাচ্যবিদরা এই ঘটনাগুলো পুঁজি করে অজুহাত দাঁড় করিয়েছে যে, দেখ, কীরূপ অন্যায় হয়েছে! কিন্তু আসল কথা হলো, বিচার বিশ্লেষণ করলে এসব ঘটনা সত্য প্রমাণিত হয় না। এগুলোর সঠিক হওয়া সম্পর্কে প্রথম যে প্রমাণটি সন্দেহ সৃষ্টি করে তা হলো, হাদীসের গ্রন্থাবলিতে এসব ঘটনার উল্লেখ (পর্যন্ত) পাওয়া যায় না। অর্থাৎ কোনো হাদীস গ্রন্থে হন্তারক কিংবা নিহত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে এমন কোনো ঘটনা বর্ণনা করা হয় নি। বরং হাদীস তো দূরের কথা, কোনো কোনো ঐতিহাসিকও এর উল্লেখ করেন নি। অথচ এধরনের ঘটনা যদি বাস্তবেই ঘটে থাকতো তাহলে হাদীসের গ্রন্থাবলি এবং কতিপয় ইতিহাস গ্রন্থে এর উল্লেখ না করার কোনো কারণ ছিল না। যেহেতু এসব ঘটনার মাধ্যমে মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের ওপর এক ধরনের আপত্তি দেখা দেয় তাই হাদীস বিশারদ ও ঐতিহাসিকরা এসব ঘটনা উল্লেখ করা হতে বিরত থাকেন– এমন সন্দেহ করার এখানে কোনো সুযোগ নেই। কেননা প্রথমত, যে পরিস্থিতিতে ও প্রেক্ষাপটে এসব ঘটনা ঘটেছে তা আপত্তিকর নয়। যদি পর্যবেক্ষণ করা হয় যে, এমন উত্তেজনা সৃষ্টি করছে, সরকারের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করছে– তাহলে এমন ঘটনা ঘটলেও তা আপত্তিকর নয়। কাজেই একথা বলা যে, মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি উঠবে তাই ঐতিহাসিকরা এবং হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি– একথা ভুল। দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি হাদীস ও ইতিহাসের সামান্যতম জ্ঞান রাখে তার কাছে এটি অজানা নয় যে, মুসলমান হাদীস বিশারদ এবং ঐতিহাসিকরা কখনো কোনো রেওয়ায়েত কেবলমাত্র ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে আপত্তি বর্তানোর ভয়ে সংকলন করা পরিত্যাগ করেন নি। এর কারণ হলো, তাদের স্বীকৃত রীতি ছিল, যে বিষয়টি তারা রেওয়ায়েত অনুসারে সঠিক দেখতেন তা সংকলন করার ক্ষেত্রে সেটির বিষয়বস্তুর কারণে কিঞ্চিত দ্বিধাও করতেন না। বরং তাদের মধ্যে কোনো কোনো হাদীস বিশারদ ও অধিকাংশ ঐতিহাসিকের রীতি ছিল– মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের সম্পর্কে যে কথাই তাদের সামনে আসতো তা রেওয়ায়েত ও দেরায়েত তথা বর্ণনাকারী ও বর্ণিত বিষয়ের নিরিখে দুর্বল হলেও আর বিশ্বাসযোগ্য না হলেও সেগুলো বিশ্বস্ততার সাথে নিজেদের

সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করে নিতেন। রেওয়ায়েত ও দেরায়েতের নীতি অনুসারে এসব বর্ণনা ও বর্ণিত বিষয় সঠিক নাকি ভুল– তার সিদ্ধান্ত বিজ্ঞ ওলামা এবং পরবর্তী যুগের বিশ্লেষকদের হাতে ছেড়ে দিতেন। আর এমনটি করার পেছনে তাদের এই অভিপ্রায় থাকতো যে, কোনো বিষয় যা মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি আরোপিত হয়– তা সঠিক হোক বা ভুল, সংকলন থেকে যেন তা বাদ না পড়ে। এ কারণেই ইতিহাসের প্রাথমিক গ্রন্থাবলিতে ভালো-মন্দ সকল প্রকার তথ্যভাণ্ডার সংকলিত হয়েছে। কিন্তু এর মানে এটি নয় যে, সেগুলো সব গ্রহণযোগ্য; বরং এখন সেগুলোর মধ্য থেকে দুর্বল বর্ণনাগুলোকে সঠিক বর্ণনা থেকে পৃথক করা আমাদের দায়িত্ব। যাহোক, এ বিষয়ে তিল পরিমাণও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মুসলমান হাদীস বিশারদ অথবা ঐতিহাসিক কখনো কোনো রেওয়ায়েতকে শুধুমাত্র এ কারণে প্রত্যাখ্যান করেন নি যে, বাহ্যত (তা) মহানবী (সা.) অথবা সাহাবীদের মর্যাদা পরিপন্থী কিংবা এর ফলে মহানবী (সা.) এবং ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হয়। যেমন কা'ব বিন আশরাফ ও আবু রাফে' ইহুদীকে হত্যার ঘটনা যা আসমা ও আবু আফাকের তথাকথিত হত্যার ঘটনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তা হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে সবিস্তারে ও পুরোপুরি বর্ণিত হয়েছে এবং কোনো মুসলমান রাবী অথবা হাদীস বিশারদ কিংবা ঐতিহাসিক তাদের রেওয়ায়েতকে প্রত্যাখ্যান করেন নি। এমতাবস্থায় আসমা ও আবু আফাকের হত্যার উল্লেখ কোনো হাদীসে না পাওয়া এবং প্রাথমিক যুগের ঐতিহাসিকদের মধ্য হতে কতেক ঐতিহাসিকেরও এ বিষয়ে নিরব থাকা এ বিষয়টি প্রায় সুনিশ্চিত করে যে, এই ঘটনা সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং কোনোভাবে কতিপয় রেওয়ায়েতে এর অনুপ্রবেশ ঘটে তা ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছে। এছাড়া এসব ঘটনার খুঁটিনাটি যদি বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে এর বানোয়াট হওয়া আরো নিশ্চিত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, আসমার ঘটনায় ইবনে সা'দ প্রমুখের রেওয়ায়েতে হন্তারকের নাম উমায়ের বিন আদী বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু এর বিপরীতে ইবনে দুরায়েদ-এর রেওয়ায়েতে হত্যাকারীর নাম উমায়ের বিন আদী নয় বরং গিশমীর উল্লেখ করা হয়েছে। সুহায়লী এই উভয় নামকে ভুল আখ্যায়িত করে বলে যে, মূলত আসমাকে তার স্বামী হত্যা করেছিল যার নাম বিভিন্ন রেওয়ায়েতে ইয়াযীদ বিন যায়েদ উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর কতক রেওয়ায়েতে এটিও উল্লেখিত হয়েছে যে, উপরিউক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ-ই আসমার হত্যাকারী ছিলো না, বরং তার হত্যাকারী তারই গোত্রের এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি ছিল। নিহত ব্যক্তির নাম ইবনে সা'দ প্রমুখগণ আসমা বিনতে মারওয়ান উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আল্লামা ইবনে আব্দুল বার-এর উক্তি অনুসারে সে আসমা বিনতে মারওয়ান ছিল না, বরং উমায়ের তার বোন বিনতে আদীকে হত্যা করেছিল। ইবনে সা'দ হত্যার সময় মধ্যবর্তী রাত উল্লেখ করেছেন, কিন্তু যুরকানীর রেওয়ায়েত অনুযায়ী দিন অথবা বেশি হলে রাতের প্রথম প্রহর প্রমাণিত হয়। কেননা সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, নিহত ব্যক্তি তখন খেজুর বিক্রি করছিল। [এই পুরো বিবরণ আমি আগেও বর্ণনা করেছি।]

এরপর দ্বিতীয় ঘটনা যার বর্ণনা এখন চলছে, তা আবু আফাকের হত্যার ঘটনা। এক্ষেত্রে ইবনে সা'দ এবং ওয়াকদী প্রমুখ হত্যাকারীর নাম সালেম বিন উমায়ের লিখেছেন, কিন্তু কোনো কোনো রেওয়ায়েতে তার নাম সালেম বিন আমর বর্ণিত হয়েছে। আর ইবনে উক্বা সালেম বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন। একইভাবে নিহত আবু আফাক সম্পর্কে ইবনে সা'দে লিখিত রয়েছে যে, সে ইহুদী ছিল; কিন্তু ওয়াকদী তাকে ইহুদী বলে নি। এরপর ইবনে সা'দ এবং ওয়াকদী উভয়ের ভাষ্যমূলে জানা যায় যে, সালেম স্বয়ং উত্তেজিত হয়ে আবু আফাককে হত্যা করেছিল; কিন্তু একটি রেওয়ায়েতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাকে মহানবী

(সা.)-এর নির্দেশে হত্যা করা হয়েছিল। হত্যার যুগের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখা হয় তাহলে জানা যায়, ইবনে সা'দ ও ওয়াকদী এই (ঘটনাকে) আসমাকে হত্যার পরে ঘটেছে বলে উল্লেখ করে, কিন্তু ইবনে ইসহাক ও আবু রবী এই ঘটনাকে আসমার হত্যার পূর্বের ঘটনা বলে থাকেন। এসব মতপার্থক্য এই ঘটনা সম্পর্কে গভীর সন্দেহ সৃষ্টি করে যে, এই ঘটনা মনগড়া ও বানোয়াট। আর এতে যদি কোনো সত্যতা থাকে তবে তা এমন রহস্যাবৃত যার সম্পর্কে বলা অসম্ভব যে, তা (আসলে) কী এবং কোন পর্যায়ের।

এই দুটি ঘটনা ভ্রান্ত হওয়ার আরেকটি প্রমাণ হলো, এই উভয় ঘটনার যুগ তা বর্ণনা করা হয়েছে যার সম্পর্কে সকল ঐতিহাসিক একমত যে, সে সময় পর্যন্ত মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে কোনোরূপ ঝগড়া-বিবাদ সংঘটিত হয় নি। যেমন ইতিহাসে বনু কায়নুকার যুদ্ধ সম্পর্কে একথা সর্বসম্মতিক্রমে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে সংঘটিত এটি প্রথম যুদ্ধ ছিল এবং বনু কায়নুকাই সর্বপ্রথম ইহুদী (গোত্র) ছিল যারা ইসলামের শত্রুতায় প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিল। অতএব এটি কীভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে যে, এই যুদ্ধের পূর্বে ইহুদী এবং মুসলমানদের মধ্যে এ ধরনের হত্যা ও রক্তপাতের ঘটনা ঘটেছিল। এছাড়া যদি বনু কায়নুকার যুদ্ধের পূর্বে এমন কোনো ঘটনা ঘটে থাকত তাহলে এই যুদ্ধের কারণসমূহের বিবরণে এ ঘটনার উল্লেখ থাকবে না– এমনটি হতেই পারে না। যুদ্ধের যে–সব কারণ বর্ণনা করা হয়েছে তাতে এসব ঘটনার উল্লেখ নেই। লেখা উচিত ছিল যে, এভাবে আমাদের দুই ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে। কমপক্ষে এতটুকু (লেখা) তো আবশ্যক ছিল যে, ইহুদী– যারা কিনা এসব ঘটনার ভিত্তিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনের একটি আপাত সুযোগ নিতে পারতো যে, কার্যত মুসলমানরাই প্রথমে তাদের উত্তেজিত ও উত্যক্ত করেছে– তাদের এসব ঘটনা সম্পর্কে হা-হুতাশ করার কথা। কিন্তু কোনো ইতিহাস গ্রন্থে এমনকি যেসব ঐতিহাসিক এ গল্প বর্ণনা করেছেন, তাদের পুস্তকসমূহেও ঘুণাক্ষরেও একথার উল্লেখ নেই যে, মদীনার ইহুদীরা কখনো কোনো আপত্তি করেছে। কোনো ব্যক্তির যদি এ ধারণা জাগে যে, হয়ত তারা আপত্তি উঠিয়ে থাকবে কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিকরা এর উল্লেখ করে নি– তবে তা হবে নিতান্ত ভুল ও ভিত্তিহীন চিন্তা। কেননা যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কখনো কোনো মুসলমান মুহাদ্দিস কিংবা ঐতিহাসিক বিরুদ্ধবাদীদের কোনো আপত্তি গোপন করেন নি। উদাহরণস্বরূপ, নাখলার অভিযান সংক্রান্ত ঘটনাতে মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আশহুরে হুরুম (তথা সম্মানিত মাস)-এর অবমাননা করার অপবাদ আরোপ করলে মুসলমান ঐতিহাসিকরা পরম বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়ে সেই আপত্তিকে নিজেদের পুস্তকসমূহে লিপিবদ্ধ করেছেন। অতএব এ পরিস্থিতিতেও যদি ইহুদীদের পক্ষ থেকে কোনো আপত্তি করা হতো তবে ইতিহাস সেটি উল্লেখ না করে থাকত না। মোটকথা, যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হোক না কেন– এ ঘটনা সঠিক সাব্যস্ত হয় না এবং এমন মনে হয় যে, হয় কোনো গোপন শত্রু কোনো মুসলমানের প্রতি আরোপ করে এ ঘটনা বর্ণনা করে দিয়েছে আর তারপর তা মুসলমানদের রেওয়ায়েতে অনুপ্রবেশ করেছে, অথবা কোনো দুর্বল মুসলমান নিজ গোত্রের প্রতি এই মিথ্যা গর্ব আরোপের জন্য যে, এর সাথে সম্পৃক্ত লোকেরা কতক ভয়াবহ কাফেরকে হত্যা করেছিল– এসব রেওয়ায়েত ইতিহাসে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। আল্লাহ্ই সবচেয়ে ভালো জানেন।

এটি হলো সেই ঘটনাবলির প্রকৃত স্বরূপ। কিন্তু যেভাবে পূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এসব ঘটনা যদি সত্যও হয় তবুও যে অবস্থায় সেগুলো সংঘটিত হয়েছে সেসব অবস্থা বিবেচনায় সেগুলোকে আপত্তিকর বলা যেতে পারে না। সেই দিনগুলোতে মুসলমানদের যে

স্পর্শকাতর অবস্থা ছিল তা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের অবস্থা আপাতদৃষ্টিতে সে ব্যক্তির অবস্থার ন্যায় ছিল যে এমন এক জায়গায় পড়ে যায় যার চারদিকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত ভয়ঙ্কর আগুন দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে এবং তার বাইরে বের হওয়ারও কোনো পথ খোলা থাকে না, আবার তার কাছে তারা দাঁড়িয়ে থাকে যারা তার জীবনের শত্রু। মুসলমানদের এমন স্পর্শকাতর অবস্থায় কোনো দুষ্ট ও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ব্যক্তি যদি তাদের মনিব ও নেতার বিরুদ্ধে উসকানিমূলক কবিতা শুনিয়ে লোকদেরকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতো এবং তাকে হত্যার করার ব্যাপারে শত্রুদের উৎসাহিত করতো তবে সে যুগের অবস্থার নিরিখে এর চিকিৎসা সে ব্যক্তিকে হত্যা করা ছাড়া আর কী-ইবা হতে পারত! আর এ হত্যাকাণ্ডও মুসলমানদের পক্ষ থেকে চরম উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় সংঘটিত হয়ে থাকবে যে অবস্থায় সামান্য হত্যাকাণ্ডকে কিসাস-এর যোগ্য মনে করা হতো না। দেখুন! মিস্টার মার্গোলিসের মতো ব্যক্তি যিনি একজন প্রাচ্যবিদ এবং প্রত্যেক বিষয়ে সাধারণত বিরোধিতাই করে থাকেন– এসব ঘটনার ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে তিরস্কারের যোগ্য মনে করেন না। যেমন মিস্টার মার্গোলিস লিখেন,

আসমা যেহেতু তার প্রতি আরোপিত পঙক্তিতে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করার জন্য তাঁর শত্রুদের কার্যত উস্কে দিচ্ছিল তাই পৃথিবীর যে–কোনো মানদণ্ডে তার হত্যাকে একটি অযৌক্তিক ও বর্বরোচিত আচরণ গণ্য করা যেতে পারে না। আর একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, উস্কানির সে রীতি যা ব্যঙ্গোক্তিমূলক কবিতা আবৃতির আদলে অবলম্বন করা হয়েছিল তা আরবের মতো দেশে অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় অনেক বেশি ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনার কারণ হতো। আর কেবল অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার বিষয়টি সে যুগের আরবে প্রচলিত রীতিনীতির বর্তমানে মহান একটি পদক্ষেপ। শুধুমাত্র অপরাধীকে হত্যা করা হয়েছে, অন্য লোকদেরকে হত্যা করা হয় নি। কেননা উস্কানিমূলক কবিতার প্রভাব কেবল একক ব্যক্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকত না, বরং পুরো গোত্রে ভয়ংকর যুদ্ধ বেধে যেত। এর পরিবর্তে ইসলামে এই সঠিক নীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে, অপরাধের শাস্তি কেবল অপরাধীর পাওয়া উচিত, তার আত্মীয়স্বজনদের নয়। মিস্টার মার্গোলিসের যদি এসব হত্যার ব্যাপারে কোনো আপত্তি থেকে থাকে তাহলে তা এর পদ্ধতি নিয়ে, অর্থাৎ কেন তাদের অপরাধের রীতিমতো ঘোষণা দিয়ে তাদেরকে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় নি? এর প্রথম উত্তর হলো, যদি এসব ঘটনাকে সঠিক বলেও ধরে নেয়া হয় তাহলে কিছু মুসলমানের একান্ত ব্যক্তিগত কাজ ছিল, যা তাদের দ্বারা উত্তেজনাকর অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে। মহানবী (সা.) এর আদেশ দেন নি, ইবনে সা'দের বর্ণনায় যা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়ত, যদি মহানবী (সা.)-এর আদেশ বলে ধরে নেয়া হয় তাহলেও নিঃসন্দেহে সে যুগের অবস্থা অনুযায়ী যদি আসমা এবং আবু আফাককে হত্যার ব্যাপারে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় গ্রেফতারের পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো এবং নিহতদের আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠরা যথাসময়ে জানতে পারত যে, তাদের লোকদের হত্যা করা হবে– তাহলে এর ফলাফল অত্যন্ত ভয়ানক হতে পারত। এছাড়া এই ঘটনাবলি মুসলমান এবং ইহুদী, একইভাবে মুসলমান এবং মদীনার মুশরিকদের মাঝে এক ব্যাপক পরিসর যুদ্ধে পর্যবসিত হতে পারত। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, মিস্টার মার্গোলিস যেখানে নিছক হত্যাকে আরবের বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে বৈধ আখ্যায়িত করেছেন সেখানে হত্যার পন্থার ব্যাপারে তার দৃষ্টি সে যুগের বিশেষ অবস্থা পর্যন্ত কেন পৌঁছাতে পারল না? তিনি এই দৃষ্টিকোণ থেকেও যদি সে সময়ের পরিস্থিতিকে দৃষ্টিপটে রাখতেন তাহলে হয়ত তার বিশ্বাস জন্মাতো, কথার কথা– যদি হত্যার

ঘটনা ঘটেও থাকতো, তাহলেও যেভাবে হত্যা করা হয়েছে সেটাই সে সময়ের অবস্থা ও সাধারণ শান্তির জন্য যথোপযুক্ত ও জরুরি ছিল। [কিন্তু বাস্তবে এমন ঘটনা ঘটেই নি।]

সারকথা হলো, আসমা এবং আবু আফাক ইহুদীর হত্যার ঘটনাবলি রেওয়াত (বর্ণনাকারী) ও দেরায়েত (ঘটনার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য) উভয় দিক থেকেই সঠিক প্রমাণিত হয় না। যদি এগুলোকে সঠিক বলে ধরেও নেওয়া হয় তাহলেও সে যুগের অবস্থা অনুযায়ী আপত্তিকর মনে করা যেতে পারে না। আর যা-ই ঘটে থাকুক, হত্যার এই ঘটনাগুলো কিছু মুসলমানের ব্যক্তিগত কাজ ছিল যা উত্তেজনার বশে তাদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। মহানবী (সা.) এই বিষয়ে কোনো আদেশ দেন নি। মহানবী (সা.) তাদের হত্যার আদেশ দিয়েছেন মর্মে আপত্তিটিই ভুল। এগুলো কল্পিত বিষয় যা মহানবী (সা.)-এর প্রতি আরোপ করা হয়েছে। ইতিহাসবিদরা যা লিখেছেন সেগুলো সঠিকভাবে পর্যালোচনা করা উচিত ছিল। এটি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে যুগ-ইমামকে মান্য করার সৌভাগ্য দান করেছেন এবং আমরা প্রত্যেকটি বিষয় পরখ করে এবং এর প্রকৃত বিষয় বুঝে এরপর বর্ণনা করার চেষ্টা করি। মহানবী (সা.)-এর সত্তার প্রতি যে অপবাদই আরোপিত হোক না কেন– তা খণ্ডন করার চেষ্টা করি। আল্লাহ্ তা'লা এসব আলেমদেরকেও বিবেক দান করুন যারা এসব বিষয়ের প্রচলন ঘটিয়ে কেবল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে এবং ইসলমাকে দুর্নাম করার চেষ্টা করে। তাদের দাবি হলো তারা ইসলামের সেবা করছে, বাস্তবে তাদের কর্মই তাদের মাঝে উগ্রতা সৃষ্টি করেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও বিবেক দান করুন।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব। তাদের মাঝে প্রথম স্মৃতিচারণ হবে প্রফেসর ডা. নাসের আহমদ খান সাহেবের যিনি পারভেজ পারওয়াজী সাহেব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সম্প্রতি কানাডায় ৮৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীঊন।

তিনি কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মোবাল্লেগ সিলসিলাহ জনাব আহমদ খান সাহেব নাসীম; তিনি দীর্ঘদিন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ মাকামী হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি অনেক সাহসী মানুষ ছিলেন। বিভিন্ন জামা'তকে তিনি বেশ সুসংগঠিত করেছিলেন। তাঁর মা ছিলেন রহমত বিবি। পরওয়াজী সাহেব কাদিয়ানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে মেট্রিকের পর কলেজে ভর্তি হন নি, কেননা তৎকালীন তা'লীমুল ইসলাম কলেজ ছিল লাহোরে অবস্থিত। এরপর কলেজ যখন রাওবয়াতে স্থানান্তরিত হয় তখন তিনি সেই কলেজে ভর্তি হন। ১৯৫৮ সালে বি.এ অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬০ সালে ইউনিভার্সিটি ওরিয়েন্টাল কলেজ থেকে এম.এ সম্পন্ন করেন আর ১৯৬৮ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রফেসর নাসের পারওয়াজী সাহেব ১৯৬০ সালে উর্দুতে এম.এ সম্পন্ন করার পর কলেজে প্রভাষক হিসেবে নিযুক্তি পান এবং তিনি মুজাফ্ফর গড়ের সরকারি কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। এরপর সাহিত্য চর্চায় অংশগ্রহণ করা শুরু করেন। আল-ফযল, মাসিক মিসবাহ, খালেদ ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো। এভাবে কাব্য-কবিতার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। খুব ভালো কবিতা লিখতেন। তা'লীমুল ইসলাম কলেজ যখন রাবওয়াতে স্থানান্তরিত হয় তখন তিনি ওয়াক্ফ করে ১৯৬১ সালে সেখানে চলে আসেন আর ১৯৬৯ পর্যন্ত প্রভাষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তা'লীমুল ইসলাম কলেজ, রাবওয়াতে উর্দু বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরেন স্টাডিজের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন যেখানে দায়িত্ব

পালনকালে তিনি পাকিস্তান এবং জাপানের সম্পর্ক উন্নয়ন করতে খুব সচেষ্ট ছিলেন। টোকিওতে জামা'ত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তিনি সাহায্য করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি ফিরে আসেন। এরপর কলেজ যখন জাতীয়করণ করা হয় তখন পাকিস্তানের বিভিন্ন কলেজে তিনি সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পাঠদান করতে থাকেন। ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিনি সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে ফয়সালাবাদ সরকারী কলেজে পাঠদান করেন। আহমদী হবার কারণে সে-যুগে তাঁকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অবশেষে যখন গ্রেফতার হওয়ার আশংকা দেখা দেয় তখন সবকিছু পরিত্যাগ করে তিনি এখানে যুক্তরাজ্যে চলে আসেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর সকাশে উপস্থিত হন। এরপর হুযূর (রাহে.)-এর নির্দেশে সুইডেনে হিজরত করেন এবং সেখানে ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর হিসেবে সেবাদান করতে থাকেন। সুইডেনে অবস্থানকালে নোবেল প্রাইজ কমিটি ফর লিটারেচারের তিনি সদস্য নিযুক্ত হন আর ১৬ বছর সেখানে তিনি দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ২০০৩ সালে হিজরত করে কানাডায় চলে যান। বিশ্ব-সাহিত্য ও শিক্ষার ময়দানে তাঁর নাম খুবই বিখ্যাত। তাঁর সহধর্মিনী আমাতুল মজীদ সাহেবা মৌলভী মোহাম্মদ আহমদ জলীল সাহেবের কন্যা। আল্লাহ তা'লা তাঁদেরকে দুজন কন্যা সন্তান এবং তিনজন পুত্র সন্তান দান করেছেন।

তাঁর সহধর্মিনী বলেন, আমাদের ৬৩ বছরের দাম্পত্যজীবন। সব উত্থান-পতন, সুখদুঃখে এবং স্বাচ্ছন্দ্য ও দরিদ্রতায় তিনি খুব উত্তমভাবে সঙ্গ দিয়েছেন। আর আমি যেহেতু পিতা-মাতার বড় কন্যা ছিলাম, রাবওয়াতে ছিলাম তাই তিনি (প্রফেসর পারওয়াজী সাহেব) কখনো আমাকে তাদের (তথা পিতা-মাতার) সেবাদানে বাধা দেন নি, বরং আমার চেয়ে তিনি তাদের প্রতি বেশি যত্নবান ছিলেন। সব আত্মীয়স্বজনের সাথে অর্থাৎ আমার শ্বশুর পক্ষের সব আত্মীয়স্বজনের সাথে তার ব্যবহার ছিল আদর্শস্থানীয়। আত্মীয়সুলভ আচরণের ক্ষেত্রে এক আদর্শ ছিলেন। আত্মীয়স্বজনের সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠাপূর্ণ আচরণ করতেন। তাদের সকল সুখদুঃখের সাথী ছিলেন। তার ছেলে তাহের আহমদ খান বলেন, সর্বাবস্থায় ও সকল পরিস্থিতিতে তার চেহারা হাস্যোজ্জ্বল থাকতো। সদা আহমদীয়া খিলাফতের সাথে আন্তরিক ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন। তিনি লিখেছেন, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি খলীফাতুল মসীহ্র সাথে যোগাযোগ রেখেছেন এবং দোয়ার আবেদন করতে থেকেছেন। বিগত দিনগুলোতে ভীষণ অসুস্থতায়ও যখন ডাক্তার নৈরাশ্য প্রকাশ করে এবং তার পক্ষে স্বহস্তে লেখাও দুস্কর ছিল তখন প্রথমে তো বার্তা পাঠাতে থাকেন, পরে কখনো কখনো স্বীয় বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুর্বল, কম্পিত হাতে আমার কাছে দোয়ার জন্য চিঠি লিখতেন। খুবই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। তার ছেলে লিখেছেন, জাপানে অবস্থানকালে আমার পিতা এনসাইক্লোপিডিয়া পুরস্কার পেয়েছিলেন যা ঐ যুগে একটি বড় পুরস্কার বলে বিবেচিত হতো। এটি তিনি খেলাফত লাইব্রেরীকে দান করেছেন। ১৯৮০-র দশকে সাহিত্যে আল্লামা ইকবাল স্বর্ণপদকও লাভ করেছিলেন। কিন্তু আহমদী হবার কারণে তাকে ডাকা হয় নি এবং তার পদকটি ঘরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তার মেয়ে আমাতুল ওয়াদুদ বলেন, আমার পিতার কুরআন করীমের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। বিনা ব্যতিক্রমে প্রতিদিন এক পারা করে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিনি বলেন, কখনো আমার কোনো প্রবন্ধ বা বক্তৃতার জন্য কোনো উদ্ধৃতির প্রয়োজন হলে নিমিষে বলে দিতেন যে, অমুক সূরার অমুক আয়াতে দেখে নাও। তিনি আরো বলেন, পিতা আমাদেরকে খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা শিখিয়েছেন,

আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা নিজের মনের কথা খুলে বলতে পারি এবং যুগ-খলীফার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি।

তার দ্বিতীয় মেয়ে সা'দিয়া বলেন, আমার পিতা খেলাফতের প্রতি নিবেদিত ছিলেন। তার কথাবার্তা ও আচরণে সর্বদা আহমদীয়া খেলাফতের জন্য সুগভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আমরা লক্ষ্য করেছি। সর্বদা দেখতাম আমাদের পিতা প্রতিটি কাজের পূর্বে যুগ-খলীফার কাছে দোয়ার আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখতেন। অসুস্থাবস্থায় শেষ দিনগুলোতে যখন ডাক্তার এসে উদ্বেগ প্রকাশ করেন, নৈরাশ্যকর কথা বলেন, তখন ডাক্তার ঘর থেকে বের হবার খানিক পরেই তিনি আমাকে বলেন, কাগজ-কলম নিয়ে এসো। এরপর দুর্বল ও কম্পিত হাতে দোয়ার জন্য চিঠি লিখেন যেভাবে আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন। অনেক বেশি সদকা-খয়রাত করতেন। কাছে যে টাকা-পয়সাই থাকতো তা সদকা হিসেবে দিয়ে দিতেন।

তার দৌহিত্রী নায়লা মাহমুদ বলেন, আমি আমার দাদাকে দেখেছি ও শিখেছি যে, ঈমান কী এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে প্রকৃত ভালোবাসা কেমন হয়ে থাকে! (দৌহিত্রী হওয়ার অর্থ হলো, তিনি তার নানা হবেন। তার পিতার নাম জাফর মাহমুদ।) তিনি বলেন, আমি তাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত ক্রমাগত শাহাদত আঙ্গুল উঠিয়ে উঠিয়ে বার বার আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে হৃদয় থেকে 'আলহামদুলিল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্' বলতে শুনে বিস্মিত হয়েছি। অর্থাৎ শেষ সময় পর্যন্ত ক্রমাগত আলহামদুলিল্লাহ্ পড়তে থেকেছেন। তিনি বলেন, খোদার প্রতি তার ভালোবাসা দেখে আমার অন্তরে একপ্রকার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্জ্বলিত হয়েছে যে, পবিত্র কুরআন এবং খেলাফতের প্রতি তার যেরূপ ভালোবাসা ছিল, সেরূপ যেন আমিও লাভ করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার সন্তানসন্ততি ও বংশধরদের তার পুণ্যসমূহ চলমান রাখার সৌভাগ্য দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা রাবওয়া নিবাসী আমীর খান ভাট্টি সাহেবের পুত্র শরীফ আহমদ ভাট্টি সাহেবের। তিনিও সম্প্রতি আটাশি বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন। মরহুম ওসিয়্যতকারী ছিলেন। নিজ অবর্তমানে স্ত্রী ছাড়াও তিনি তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন। এক ছেলে হিফাযত মরকযে কাজ করছেন। দ্বিতীয় ছেলে তাহের আহমদ ভাট্টি মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে সিয়েরালিয়নে সেবা করার সৌভাগ্য পাচ্ছেন। তার ছেলে মুরব্বী সিলসিলাহ্ তাহের ভাট্টি সাহেব লিখেছেন, আমার পিতা বলতেন, পণ্ডিত লেখরামের নিহত হওয়া সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী যখন পূর্ণ হয় তখন তার পিতা মোহতরম আমীর খান ভাট্টি সাহেব স্বল্পবয়স্ক যুবক ছিলেন। তার ভাষ্যমতে, এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়াতে তাঁর হৃদয়ে আহমদীয়াতের সত্যতা জায়গা করে নেয়। কিন্তু স্বল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে কাদিয়ান যাওয়া এবং বয়আত করা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। ১৯৭৪ সালে যে নৈরাজ্য দেখা দেয় এবং বৈরি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখন তিনি লালিয়াতে থাকতেন, সেখান থেকে রাবওয়া চলে আসেন এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। টেক্সটাইল মিলে তিনি চাকুরি করতেন। কখনো আহমদীয়াতের বিষয়টি গোপন রাখেন নি। যেখানেই যেতেন সেখানে প্রথম দিনই লোকদের বলে দিতেন যে, আমি একজন আহমদী; আমার সাথে যদি সম্পর্ক রাখতে হয় তো রাখো, আমি তো আহমদী হিসেবেই নিজের পরিচয় দিব। তার ভাই লতীফ আহমদ সাহেব জার্মানিতে থাকেন। তিনি বলেন, আমার ভাই টেক্সটাইল মিলে চাকুরি করতেন। এক আহমদী-বিদ্বেষী তার

ডিপার্টমেন্টে আসে আর বলে, আমি জানতে পেরেছি তুমি নাকি আহমদী। তিনি বলেন, ঠিক শুনেছেন, আমি একজন আহমদী সদস্য। সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে বাজে কথা বলা শুরু করে এবং আরো বলে, এই মিলে হয় তুমি থাকবে নতুবা আমি। আর সে মিলের মালিকদের উস্কে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তখন তিনি দোয়া আরম্ভ করেন যে, হে আল্লাহ্! তোমার মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোহাই, আমাকে সাহায্য করো এবং এই দুষ্কৃতিকারী ব্যক্তিকে ব্যর্থ করে দাও। তিনি বলেন, কিছুদিন পর একজন শ্রমিক এসে তাকে বলে, যে ব্যক্তি আপনার সাথে অশোভন আচরণ করছিল, সে মিলের বাইরে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বসে আছে আর মিলের মালিক একটি লেনদেনে তাকে চুরির সাথে সম্পৃক্ত পেয়েছে এবং তাকে মিল থেকে বিদায় করে দিয়েছে।

তিনি ছিলেন তাহাজ্জুদগুযার, নিয়মিত পাঁচ বেলার নামায আদায়কারী এবং সদা দোয়ায় মশগুল থাকতেন। জামা'তের বই পুস্তক অধিক হারে পাঠ করতেন আর অবসর গ্রহণের পর তো আরো বেশি পড়া আরম্ভ করেন। সর্বদা জামা'তের কোনো না কোনো বই তাঁর বালিশের পাশে থাকতো এবং তিনি তা পাঠে মগ্ন থাকতেন। যখনই যুগ-খলীফার পক্ষ থেকে কোনো দোয়ার আহ্বান করা হতো, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেই দোয়া পাঠে মগ্ন হয়ে যেতেন। অনেক বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করতেন।

তার (মুরব্বী) ছেলে বলেন, আমি যখন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়তাম তখন আমাকে আব্বা বলতেন, স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। ভাট্টি সাহেব নিজের পন্থা ছেলেকে বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় দিনে হাজার বারের অধিক দরূদ শরীফ পাঠ করি।

আল্লাহ্ তাঁর সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচারণ করুন এবং তাঁর সন্তানদেরকে তাঁর পুণ্য অব্যাহত রাখার সৌভাগ্য দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ প্রফেসর আব্দুল কাদের ডাহরী সাহেবের যিনি নবাবশাহ জেলার সাবেক আমীর ছিলেন। ৯২ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীঊন। তার এক পুত্র ও পাঁচ জন কন্যা সন্তান রয়েছে। তাঁর ছেলে সামার আহমদ লেখেন, তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তার পিতা মরহুম রঈস মুহাম্মদ মুকীম খান ডাহরী সাহেবের মাধ্যমে। আব্দুল কাদের সাহেব ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং নিষ্ঠাবান মানুষ। তার ছেলে লেখেন, সমাজের নিষ্পেষিত শ্রেণির সাথে ওঠাবসা করতে কোনোরূপ লজ্জাবোধ করতেন না। সেখানে কোনো দরিদ্র ব্যক্তিকে পাশাপাশি বসানোকে অনেক বড় দূষণীয় বলে গণ্য করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ধি ভাষায় মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। সে-যুগে সিন্দু প্রদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘাটতি ছিল। শিক্ষার প্রতি অনুরাগ থাকায় হায়দ্রাবাদের একটি কলেজে প্রভাষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। তার আগ্রহ দেখে সেখানকার প্রিন্সিপাল তাকে বলেন, নবাবশাহ-এ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করুন এবং সেখানে সান্ধ্যকালীন ক্লাস শুরু করুন। সেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হয় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান বেশ উন্নতি করে আর তার পরিশ্রমের কারণে একসময় তা কলেজে রূপান্তরিত হয় এবং সিন্দুর প্রসিদ্ধ কলেজগুলোর মাঝে সেটি পরিগণিত হতে থাকে। তেমনিভাবে সিন্ধু প্রদেশের বড় বড় সকল রাজনৈতিক পরিবারের সাথে অনেক ভালো সম্পর্ক ছিল আর তাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিতেন যে, আমি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য। নিজ সন্তানদেরকেও বলতেন যে, কখনো ভয় পেয়ে নিজ আহমদীয়াতের বিশ্বাস গোপন করবে না। সিন্ধী ভাষায় সবসময় বলতেন যে, আমরা তো আহমদীয়াতের অলঙ্কার পরিধান করে রেখেছি যা এক সম্মানসূচক নিদর্শন। হযরত

খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী সিন্ধী ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেছেন এবং তাঁর (রাহে.) নির্দেশনা অনুযায়ী তফসীরে সগীরের সিন্ধী ভাষায় দুই খণ্ড সম্বলিত অনুবাদ করারও সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছেন। পবিত্র কুরাআনের অনুবাদ এবং নির্বাচিত আয়াতসমূহ সম্বলিত একটি লিফলেট ছাপানোর কারণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ছাড়াও চারজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ২৯৫/সি ধারায় মামলা দায়ের করা হয় যাদের মাঝে তাঁর নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিন্ধী ভাষা ছাড়াও উর্দু ভাষায় এতটা দক্ষতা রাখতেন যে, যাকে উদ্দেশ্য করেই লিখতেন সে-ই তাঁর লেখায় প্রভাবিত হতো। ফযলে উমর ফাউন্ডেশনের সদস্যও ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডির ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে দিকনির্দেশনা নিতে আসতো। তাঁর বন্ধুবান্ধবের গণ্ডি অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। তিনি সিন্ধী ভাষায় একটি পুস্তকও রচনা করেছেন যেটি শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও ছাত্র সকলের দিকনির্দেশনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া সিন্ধুর ডাহর গোত্র সম্পর্কেও অভিধানে বিরাজমান তথ্য যাতে হাস্যকর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছিল, কুরআনের শিক্ষা অনুসারে তিনি বিভিন্ন সরকারকে যুক্তিপ্রমাণের মাধ্যমে বুঝিয়েছেন আর অভিধান থেকে ঐসব হাস্যকর শব্দ তিনি বের করিয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন। তাঁর সন্তানদেরকেও তাঁর পুণ্য ধরে রাখার সৌভাগ্য দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ওমর শরীফ খান সাহেবের যিনি ইদানিং আমেরিকায় বসবাস করছিলেন। ৮৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজীঊন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি একজন ওসিয়্যতকারী ছিলেন। ১৯৩৯ সালে তানজানিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তাদের বংশে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তাঁর পিতা ড. হাবীবুল্লাহ খান সাহেবের মাধ্যমে যিনি তানজানিয়াতে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। শরীফ খান সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা কাদিয়ান থেকে লাভ করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ১৯৫৪-৫৫ সালের খুতবার কল্যাণে অষ্টম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। এরপর ১৯৬৩ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বর্ণপদকসহ প্রাণীবিদ্যায় এম.এসসি সম্পন্ন করেন। ১৯৯৬ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাণীবিদ্যায় পিএইচ.ডি সম্পন্ন করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী ১৯৬৩ সালে তা'লীমুল ইসলাম কলেজে শিক্ষকতার সাথে সম্পৃক্ত হন এবং ১৯৯৮ সালে অবসর গ্রহণ করা পর্যন্ত তিনি ধারাবাহিকভাবে ৩৫ বছর সেবাদানের সৌভাগ্য পেয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রফেসর সাহেবের প্রায় ২৫০টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় এবং তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল সরীসৃপ প্রাণী। তিনি অনেক গবেষণা করতেন। সাপ, টিকটিকি ও কীটপতঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর অনেক গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে। আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম। আমাদের পুরো ক্লাসকে তিনি বাইরে নিয়ে যেতেন আর দেখাতেন যে, প্রকৃতিতে কেমন ও কোন ধরনের প্রাণী, কীটপতঙ্গ বিদ্যমান। ২০০২ সালে পাকিস্তানে তাঁকে বছরের সেরা প্রাণীবিদের পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। আমেরিকার মুজিবুল্লাহ্ চৌধুরী সাহেব লেখেন যে, ২০০৮ সালে আমি তার সাথে মসজিদের চাঁদা সংগ্রহের বিষয়ে কথা বলি। তখন তিনি বলেন, আমাদের কাছে দেয়ার মতো তেমন কিছু নেই, তবুও বাসায় আসুন। বাসায় গেলে তার স্ত্রী আসেন আর একটি থলে বের করে সামনে রেখে দেন যাতে ছিল তার পিতামাতা বা শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রাপ্ত স্বর্ণালঙ্কার; তিনি বলেন, এগুলোই আমাদের কাছে আছে, নিয়ে যান। অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী মানুষ ছিলেন।

ছাত্রদের সাথে সবসময় হাসিখুশি আর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন।

তার বড় ছেলে জাফরুল্লাহ সাহেব লিখেছেন, (পরবর্তীতে কিছু কথা এসেছে,) আমেরিকা ও কানাডা থেকে কিছু বিজ্ঞানী রাবওয়ায় প্রফেসর ড. শরীফ খান সাহেবের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন। সেই বিজ্ঞানীদের মতে, সরীসৃপ বিদ্যায় পাকিস্তানে শরীফ খান সাহেবের থেকে অধিক অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞ নেই। তিনি অনেক বড় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তার পুত্র রাশেদ যুবায়ের সাহেব বলেন, যৌবন থেকেই তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত এবং নামায-রোযায় নিয়মিত ছিলেন আর মসজিদে কমর-এ নামাযের ইমামতিও করতেন। বাজামা'ত নামায আদায় ছাড়াও পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং তফসীর পড়ার অনেক আগ্রহ ছিল আর তার পড়ালেখার গণ্ডিও ছিল ব্যাপক।

তার পৌত্র মাশহুদ আহমদ খান বলেন, আমাদের দাদা অনেক আধ্যাত্মিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, খোদা তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। তিনি সময়মতো নামায আদায় করা এবং কুরআন করীম পাঠের প্রতি গভীর মনোনিবেশের দিকে বিশেষ তাগিদ দিতেন। আহমদীয়া খিলাফতের সাথে অনেক বেশি ভালোবাসা ছিল তার আর সর্বদা যুগ-খলীফার কাছে পত্র লিখতেন আর খুতবা শোনার প্রতি নিজেরও মনোযোগ ছিল আর ঘরের সদস্যদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন এবং উৎসাহ যোগাতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার বংশধরদের মাঝেও তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)